

সূরা আল-হিজর:৬ষ্ঠ রুকুঃ আয়াত সংখ্যাঃ(৮০-৯৯)

Sisters'Forum in Islam.com

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৭৮) وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ

৭৯) فَأَنزَلْنَاهُمْ مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لِبِلَامٍ مُّبِينٍ
উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধ এলাকা প্রকাশ্য পথের ধারে অবস্থিত।

হযরত শো' আয়েবের (আ) সম্প্রদায়ের লোক। এ সম্প্রদায়টির নাম ছিল বনী মাদইয়ান। তাদের এলাকার কেন্দ্রীয় শহরেরও নাম ছিল মাদইয়ান এবং সমগ্র এলাকাটিকেও মাদইয়ান বলা হতো। আর “আইকা” ছিল তাবুকের প্রাচীন নাম। এ শব্দটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ঘন জংগল। বর্তমানে একটি পাহাড়ী ঝরণার নাম আইকা। এটি জাবালে নূরে উৎপন্ন হয়ে আফাল উপত্যকায় এসে পড়েছে।

আল্লাহর গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রধান ৬টি প্রাচীন জাতির মধ্যে পঞ্চম জাতি হ' ল ‘আহলে মাদইয়ান’ ।
‘মাদইয়ান’ হ' ল লূত সাগরের নিকটবর্তী সিরিয়া ও হিজাযের সীমান্তবর্তী একটি জনপদের নাম। যা অদ্যাবধি পূর্ব জর্ডনের সামুদ্রিক বন্দর ‘মো ‘আন’ (معان) রয়েছে।

মাদইয়ানের (মাদায়েন) মূল এলাকাটি হিজাযের উত্তর পশ্চিমে এবং ফিলিস্তিনের দক্ষিণে লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত ছিল। তবে সাইনা (সিনাহ) উপদ্বীপের পূর্ব উপকূলেরও এর কিছুটা অংশ বিস্তৃত ছিল।

মাদইয়ান আসলে একটি শহরের নাম। বলা হয়ে থাকে, মাদইয়ান ইবন ইবরাহীম তার পত্তন করেছিলেন। [দেখুন, কুরতুবী] উক্ত শহরের অধিবাসীগণকে মাদইয়ানবাসী বলার পরিবর্তে শুধু “মাদইয়ান” বলা হত। আল্লাহ তা'আলার বিশিষ্ট নবী শু'আইব আলাইহিস সালাম উক্ত মাদইয়ান কওমের সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন তাই তাকে “তাদের ভাই” বলা হয়েছে। [ইবন কাসীর] এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহ করে তাদের স্বজাতির এক ব্যক্তিকে তাদের কাছে নবী হিসেবে প্রেরণ করলেন, যেন তার সাথে জানাশোনা থাকার কারণে সহজেই তার হেদায়াত গ্রহণ করে ধন্য হতে পারে।

এখানকার অধিবাসীরা ছিল একটি বিরাট ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। প্রাচীন যুগে যে বাণিজ্যিক সড়কটি লোহিত সাগরের উপকূল ধরে ইয়ামান থেকে মক্কা ও ইয়াম্মু হয়ে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং দ্বিতীয় যে বাণিজ্যিক সড়কটি ইরাক থেকে মিসরের দিকে চলে যেতো তাদের ঠিক সন্ধিস্থলে এ জাতির জনপদগুলো অবস্থিত ছিল।

এ কারণে আরবের ছোট বড় সবাই মাদইয়ানী জাতি সম্পর্কে জানতো এবং এ জাতিটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পরও সারা আরবে এর খ্যাতি অপরিবর্তিত থাকে কারণ আরববাসীদের বাণিজ্যিক কাফেলা মিসর ও ইরাক যাবার পথে দিন রাত এর ধ্বংসাবশেষের ভেতর দিয়েই চলাচল করতো।

মাদইয়ানবাসীদের সম্পর্কে আর একটি প্রয়োজনীয় কথা ভালভাবে জেনে নিতে হবে। সেটি হচ্ছে, এ মাদইয়ানের অধিবাসীরা হযরত ইবরাহীমের পুত্র মাদিয়ান এর সাথে বিভিন্ন রকমের সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। মাদিয়ান ছিলেন হযরত ইবরাহীমের তৃতীয় স্ত্রীর কানতুরা এর গর্ভজাত সন্তান। মাদইয়ান (مدين) ছিলেন হাজেরা ও সারাহর মৃত্যুর পরে হযরত ইবরাহীমের আরব বংশোদ্ভূত কেন ‘আনী স্ত্রী কানতুরা বিনতে ইয়াক্বত্বিন (قنطورا بنت يقطن) -এর ৬টি পুত্র সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র।

ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১৬৪ পৃঃ।

হযরত শো ‘আয়েব (আঃ) এদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। ইনি হযরত মূসা (আঃ)-এর শ্বশুর ছিলেন। কওমে লূত-এর ধ্বংসের অনতিকাল পরে কওমে মাদইয়ানের প্রতি তিনি প্রেরিত হন (হুদ ১১/৮৯)। চমৎকার বাগ্মিতার কারণে তিনি (خطيب الأنبياء) ‘খাত্বীবুল আন্বিয়া’ (নবীগণের মধ্যে সেরা বাগ্মী) নামে খ্যাত ছিলেন।

আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৭৩।

আহলে মাদইয়ান-কে পবিত্র কুরআনে কোথাও কোথাও ‘আছহাবুল আইকাহ’ (اصحاب الأيكة) বলা হয়েছে। যার অর্থ ‘জঙ্গলের বাসিন্দাগণ’। এটা বলার কারণ এই যে, এই অবাধ্য জনগোষ্ঠী প্রচন্ড গরমে অতিষ্ঠ হয়ে নিজেদের বসতি ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিলে আল্লাহ তাদেরকে সেখানেই ধ্বংস করে দেন। এটাও বলা হয় যে, উক্ত জঙ্গলে ‘আইকা’ (الأيكة) বলে একটা গাছকে তারা পূজা করত। যার আশপাশে জঙ্গল বেষ্টিত ছিল।

إمام مبین (প্রকাশ্য পথ) এর অর্থও আম রাস্তা, যে রাস্তা দিয়ে লোক দিনরাত্রি যাওয়া-আসা করে। উভয় শহর বলতে লূত সম্প্রদায়ের শহর ও শুআইব জাতির বসতি মাদিয়ানকে বুঝানো হয়েছে। এই দুই শহর ছিল একে অপরের সন্নিহিত।

মাদইয়ান ও আইকাবাসীদের এলাকাও হেজাজ থেকে ফিলিস্তিন ও সিরিয়া যাবার পথে পড়ে।

আল কুর’ আনে জানা যায়---(আরাফ ৮৫-৮৬)

আর মাদইয়ানবাসীদের কাছে আমি তাদের ভাই শোআইবকে পাঠাই। সে বলেঃ “হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের সুস্পষ্ট পথনির্দেশনা এসে গেছে। কাজেই ওজন ও পরিমাপ পুরোপুরি দাও, লোকদের পাওনা জিনিস কম করে দিয়ো না। এবং পৃথিবী পরিশুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর তার মধ্যে আর বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। এরই মধ্যে রয়েছে তোমাদের কল্যাণ, যদি তোমরা যথার্থ মুমিন হয়ে থাকো।

আর লোকদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করার, ঈমানদারদেরকে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেবার এবং সোজা পথকে বাঁকা করার জন্য (জীবনের) প্রতিটি পথে লুটেরা হয়ে বসে থাকো না। স্মরণ করো, সেই সময়ের কথা যখন তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক। তারপর আল্লাহ তোমাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেন। আর বিপর্যয় সৃষ্টিকারীরা কোন ধরনের পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে তা একবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখো। আরাফঃ ৮৬

আহলে মাদইয়ানের উপরে আপত্তি গযবের বিবরণ

হযরত শো ‘আয়েব (আঃ)-এর শত উপদেশ উপেক্ষা করে যখন কওমের নেতারা তাদের অন্যায় কর্মসমূহ চালিয়ে যাবার ব্যাপারে অনড় রইল এবং নবীকে জনপদ থেকে বের করে দেবার ও হত্যা করার হুমকি দিল ও সর্বোপরি হঠকারিতা করে তারা আল্লাহর গযব প্রত্যক্ষ করতে চাইল, তখন তিনি বিষয়টি আল্লাহর উপরে সোপর্দ করলেন এবং কওমের নেতাদের বললেন, **وَإِنْ تَقْبِضُوا إِلَيْنِي مَعَكُمْ رَفِيبٌ** (ঠিক আছে), তোমরা এখন আযাবের অপেক্ষায় থাক। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম’ (হুদ ১১/৯৩)।

বলা বাহুল্য, আল্লাহ তা ‘আলা স্বীয় চিরন্তন বিধান অনুযায়ী শো ‘আয়েব (আঃ) ও তাঁর ঈমানদার সাথীগণকে উক্ত জনপদ হ’ তে অন্যত্র নিরাপদে সরিয়ে নিলেন। অতঃপর জিবরীলের এক গগণবিদারী নিনাদে অবাধ্য কওমের সকলে নিমেষে ধ্বংস হয়ে গেল। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

অতঃপর যখন আমার আদেশ এসে গেল, তখন আমি শো ‘আয়েব ও তার ঈমানদার সাথীদের নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করলাম। আর পাপিষ্ঠদের উপর বিকট গর্জন আপতিত হ’ ল। ফলে তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে মরে পড়ে রইল’ । ‘(তারা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হ’ ল) যেন তারা কখনোই সেখানে বসবাস করেনি। সাবধান! ছামূদ জাতির উপর অভিসম্পাতের ন্যায় মাদইয়ানবাসীর উপরেও অভিসম্পাত’ (হুদ ১১/৯৪-৯৫)। যদিও তারা দুনিয়াতে মযবুত ও নিরাপদ অট্টালিকায় বসবাস করত।

আছহাবে মাদইয়ানের উপরে গযবের ব্যাপারে কুরআনে **طَلَّةٌ** (শো ‘আরা ১৮৯), **رَجْفَةٌ** (হুদ ৯৪), **صَيْحَةٌ** (আ ‘রাফ ৮৮) তিন ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

যার অর্থ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, বিকট নিনাদ, ভূমিকম্প।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আহলে মাদইয়ানের উপরে প্রথমে সাতদিন এমন ভীষণ গরম চাপিয়ে দেওয়া হয় যে, তারা দহন জ্বালায় ছুটফট করতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তা ‘আলা একটি ঘন কালো মেঘমালা পাঠিয়ে দিলেন, যার নীচ দিয়ে শীতল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। তখন কওমের লোকেরা উর্ধ্বশ্বাসে সেখানে দৌড়ে এল। এভাবে সবাই জমা হবার পর হঠাৎ ভূমিকম্প শুরু হ’ ল এবং মেঘমালা হ’ তে শুরু হল অগ্নিবৃষ্টি। তাতে মানুষ সব পোকা-মাকড়ের মত পুড়ে ছাই হ’ তে লাগল। ইবনু আববাস (রাঃ) ও মুহাম্মাদ বিন কা ‘ব আল-কুরায়ী বলেন, অতঃপর তাদের উপর নেমে আসে এক বজ্রনিনাদ। যাতে সব মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল’ । তাফসীর ইবনে কাছীর, শো ‘আরা ১৮৯; কুরতুবী, ঐ।

এভাবে কোনরূপ গ্রেফতারী পরোয়ানা ও সিপাই-সাত্তীর প্রহরা ছাড়াই আল্লাহদ্রোহীরা সবাই পায়ে হেঁটে স্বেচ্ছায় বধ্যভূমিতে উপস্থিত হয় এবং চোখের পলকে সবাই নিস্তনাবুদ হয়ে যায়।

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ৮০ : ১৫

৮০. আর অবশ্যই হিজরবাসীরা রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল;

وَأَتَيْنَهُمُ آيَاتُنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ৮১ : ১৫

৮১. আমরা তাদেরকে আমাদের নিদর্শন দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করেছিল।

و كَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ۝ ٥٢ : ١٥

৮২. আর তারা পাহাড় কেটে ঘর নির্মাণ করত নিরাপদে।

فَأَخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ۝ ٥٣ : ١٥

৮৩. অতঃপর ভোরে বিকট চীৎকার তাদের পাকড়াও করল।

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ ٥٤ : ১৫

৮৪. কাজেই তারা যা অর্জন করত তা তাদের কোন কাজে আসেনি।

‘আদ জাতির ধ্বংসের প্রায় ৫০০ বছর পরে হযরত সালেহ (আঃ) কওমে সামূদ-এর প্রতি নবী হিসাবে প্রেরিত হন। সামূদ আরবের প্রাচীন জাতিগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় জাতি। আদ জাতির পরে এরাই সবচেয়ে বেশী খ্যাতি ও পরিচিতি অর্জন করে।

কওমে ‘আদ ও কওমে ছামূদ একই দাদা ‘ইরাম’ -এর দুটি বংশধারার নাম।

তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল ‘হিজর’ যা শামদেশ অর্থাৎ সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে একে সাধারণভাবে ‘মাদায়েনে সালেহ’ বলা হয়ে থাকে।

উত্তর-পশ্চিম আরবের যে এলাকাটি আজো ‘আল হিজর’ নামে খ্যাত, সেখানেই ছিল এদের আবাস। আজকের সাউদী আরবের অন্তর্গত মদীনা ও তাবুকের মাঝখানে মদীনা থেকে প্রায় ২৫০/৩৫০ কিঃ মিঃ দূরে একটি স্টেশন রয়েছে, তার নাম মাদায়েনে সালেহ। এটিই ছিল সামূদ জাতির কেন্দ্রীয় স্থান। সামূদ জাতির লোকেরা পাহাড় কেটে যেসব বিপুলায়তন ইমারত নির্মাণ করেছিল এখনো অনেক এলাকা জুড়ে সেগুলো অবস্থান করছে। [ড. শাওকী আবু খালীল, আতলাসুল কুরআন, পৃ. ৩৪-৩৬]

অভিশপ্ত অঞ্চল হওয়ার কারণে এলাকাটি আজও পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। কেউ সেখানে বসবাস করে না। ৯ম হিজরীতে তাবুক যুদ্ধে যাওয়ার পথে মুসলিম বাহিনী হিজর অবতরণ করলে রাসূলুল্লাহ (সো) তাদেরকে সেখানে প্রবেশ করতে নিষেধ করে বলেন,

-لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

‘তোমরা এসব অভিশপ্তদের এলাকায় প্রবেশ করো না ক্রন্দনরত অবস্থায় ব্যতীত। যদি ক্রন্দন করতে না পার, তাহলে প্রবেশ করো না। তাহলে তোমাদের উপর ঐ গযব আসতে পারে, যা তাদের উপর এসেছিল’ । বুখারী হা/৪৩৩; মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/৫১২৫ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায় ‘যুলুম’ অনুচ্ছেদ।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ৯ম হিজরীতে তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সো) সিরিয়া ও হেজাজের মধ্যবর্তী ‘হিজর’ নামক সে স্থানটি অতিক্রম করেন, যেখানে সামূদ জাতির উপরে গযব নাযিল হয়েছিল। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দেন, কেউ যেন ঐ গযব বিধ্বস্ত এলাকায় প্রবেশ না করে এবং ওখানকার কূয়ার পানি ব্যবহার না করে’ । বুখারী হা/৪৩৩, মুসলিম, আহমাদ, ইবনু কাছীর, সূরা আ ‘রাফ ৭৩।

সামূদ জাতির লোকেরা পাহাড় কেটে যেসব বিপুলায়তন ইমারত নির্মাণ করেছিল এখনো হাজার হাজার একর এলাকা জুড়ে সেগুলো অবস্থান করছে। এ নিবুম পুরীটি দেখে আন্দাজ করা যায় যে, এক সময়ে এ নগরীর জনসংখ্যা চার পাঁচ লাখের কম ছিল না। কুরআন নাযিল হওয়ার সময়কালে হেজাযের ব্যবসায়ী কাফেলা এ প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করতো। তাবুক যুদ্ধের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ এলাকা অতিক্রম করছিলেন তখন তিনি মুসলমানদেরকে এ শিক্ষণীয় নিদর্শনগুলো দেখান এবং এমন শিক্ষা দান করেন যা এ ধরনের ধ্বংসাবশেষে থেকে একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

‘আদ জাতির ধ্বংসের পর সামূদ জাতি তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। তারাও ‘আদ জাতির মত শক্তিশালী ও বীরের জাতি ছিল। তারা প্রস্তর খোদাই ও স্থাপত্য বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। সমতল ভূমিতে বিশালকায় অট্টালিকা নির্মাণ ছাড়াও পর্বতগাত্র খোদাই করে তারা নানা রূপ প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করত। তাদের স্থাপত্যের নিদর্শনাবলী আজও বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর গায়ে ইরামী ও ছামূদী বর্ণমালার শিলালিপি খোদিত রয়েছে।

সামূদদের গৃহ নির্মাণ শিল্পটি ছিল ভারতের ইলোরা, অজন্তা গৃহাও অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত পর্বত গাত্রের গৃহের ন্যায়। অর্থাৎ তারা পাহাড় কেটে তার মধ্য বিরাট বিরাট ইমারত তৈরী করতো। মাদায়েনে সালেহ এলাকায় এখনো তাদের এসব ইমারত সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় রয়ে গেছে। সেগুলো দেখে এ জাতি স্থাপত্য বিদ্যায় কেমন বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করেছিল, তা অনুমান করা যায়।

পার্শ্বিক বিত্ত-বৈভব ও ধনৈশ্বর্যের পরিণতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশুভ হয়ে থাকে। বিত্তশালীরা আল্লাহ ও আখেরাতকে ভুলে গিয়ে ভ্রান্ত পথে পা বাড়ায়। সামূদ জাতির বেলায়ও তাই হয়েছিল। অথচ কওমে নূহের কঠিন শাস্তির ঘটনাবলী তখনও লোকমুখে আলোচিত হত। আর কওমে ‘আদ-এর নিশ্চিহ্ন হওয়ার ঘটনা তো তাদের কাছে একপ্রকার টাটকা ঘটনাই ছিল। অথচ তাদের ভাইদের ধ্বংসস্তম্ভের উপরে বড় বড় বিলাসবহুল অট্টালিকা নির্মাণ করে ও বিত্ত বৈভবের মালিক হয়ে তারা পিছনের কথা ভুলে গেল। এমনকি তারা ‘আদ জাতির মত অহংকারী কার্যকলাপ শুরু করে দিল। তারা শিরক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত হল। এমতাবস্থায় তাদের হেদায়াতের জন্য তাদেরই বংশের মধ্য হ’ তে সালেহ (আঃ)-কে আল্লাহ নবী মনোনীত করে পাঠালেন।

কওমে সামূদ-এর উপরে আপতিত গযবের বিবরণ

ইবনু কাছীর বর্ণনা করেন যে, হযরত সালেহ (আঃ)-এর নিরন্তর দাওয়াতে অতিষ্ঠ হয়ে সম্প্রদায়ের নেতারা স্থির করল যে, তাঁর কাছে এমন একটা বিষয় দাবী করতে হবে, যা পূরণ করতে তিনি ব্যর্থ হবেন এবং এর ফলে তাঁর দাওয়াতও বন্ধ হয়ে যাবে। সেমতে তারা এসে তাঁর নিকটে দাবী করল যে, আপনি যদি আল্লাহর সত্যিকারের নবী হন, তাহলে আমাদেরকে নিকটবর্তী ‘কাতেবা’ পাহাড়ের ভিতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী সবল ও স্বাস্থ্যবতী উষ্ট্রী বের করে এনে দেখান।

এ দাবী শুনে হযরত সালেহ (আঃ) তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, যদি তোমাদের দাবী পূরণ করা হয়, তবে তোমরা আমার নবুঅতের প্রতি ও আমার দাওয়াতের প্রতি ঈমান আনবে কি-না। জেনে রেখ, উক্ত মুজোযা প্রদর্শনের পরেও যদি তোমরা ঈমান না আনো, তাহলে আল্লাহর গযবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। এতে সবাই স্বীকৃত হল ও উক্ত মর্মে অঙ্গীকার করল।

তখন সালেহ (আঃ) সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ পাক তার দোআ কবুল করলেন এবং বললেন,

إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَبِعْهُمْ وَاصْطَبِرْ

‘আমরা তাদের পরীক্ষার জন্য একটি উষ্ট্রী প্রেরণ করব। তুমি তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং ধৈর্য ধারণ কর’ (ক্বামার ৫৪/২৭)।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের গায়ে কম্পন দেখা দিল এবং একটি বিরাট প্রস্তর খন্ড বিস্ফোরিত হয়ে তার ভিতর থেকে কওমের নেতাদের দাবীর অনুরূপ একটি গর্ভবতী ও লাভণ্যবতী তরতাজা উষ্ট্রী বেরিয়ে এল।

সালেহ (আঃ)-এর এই বিস্ময়কর মু ‘জেযা দেখে গোত্রের নেতা সহ তার সমর্থক লোকেরা সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেল। অবশিষ্টরাও হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করল। কিন্তু প্রধান ধর্মনেতা ও অন্যান্য সমাজ নেতাদের বাধার কারণে হতে পারল না। তারা উল্টা বলল,

...- قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ

‘আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা আছে তাদেরকে অকল্যাণের প্রতীক মনে করি...’ (নামল ২৭/৪৭)।

হযরত সালেহ (আঃ) কওমের নেতাদের এভাবে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে এবং পাল্টা তাঁকেই দায়ী করতে দেখে দারুণভাবে শংকিত হলেন যে, যেকোন সময়ে এরা আল্লাহর গযবে ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি তাদেরকে সাবধান করে বললেন,

قَالَ طَائِفٌ مِّنْكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ

‘দেখ, তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল আল্লাহর নিকটে রয়েছে। বরং তোমরা এমন সম্প্রদায়, যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে’ (নামল ২৭/৪৭)। অতঃপর পয়গম্বরসূলভ দয়া প্রকাশ করে বললেন,

-(৬৪ হুদ) - هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ

‘এটি আল্লাহর উষ্ট্রী। তোমাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ। একে আল্লাহর যমীনে স্বাধীনভাবে চরে বেড়াতে দাও। সাবধান! একে অসৎ উদ্দেশ্যে স্পর্শ করো না। তাহলে তোমাদেরকে সত্বর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে’ (হুদ ১১/৬৪)।

এ উষ্ট্রীকে ‘আল্লাহর উষ্ট্রী’ বলা হয়েছে কারণ, এটি আল্লাহর আসীম শক্তির নিদর্শন এবং সালেহ আলাইহিস সালামের মু’জিযা হিসেবে বিস্ময়কর পন্থায় সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন, ঈসা আলাইহিস সালামের জন্যও অলৌকিক পন্থায় হয়েছিল বলে তাকে রুহুল্লাহ বা ‘আল্লাহর পক্ষ থেকে আত্মা’ বলা হয়েছে। এর দ্বারা ঈসাকে আ সম্মানিত করাই উদ্দেশ্য।

আল্লাহ উক্ত উষ্ট্রীর জন্য এবং লোকদের জন্য পানি বণ্টন করে দিয়েছিলেন। তিনি নবীকে বলে দেন,

نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌّ

‘হে সালেহ! তুমি ওদেরকে বলে দাও যে, কূপের পানি তাদের মধ্যে বণ্টিত হয়েছে। প্রত্যেক পালায় তারা হাযির হবে’ (ক্বামার ৫৪/২৮)।

لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ

‘একদিন উষ্ট্রীর ও পরের দিন তোমাদের (পানি পানের) জন্য পালা নির্ধারিত হয়েছে (ক্বামার ৫৪/২৮; শো ‘আরা ২৬/১৫৫)।

আল্লাহ তা ‘আলা কওমে সামূদ-এর জন্য উক্ত উষ্ট্রীকেই সর্বশেষ পরীক্ষা হিসাবে নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি বলেন,

-وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا

‘আর আমরা সামূদকে উষ্ট্রী দিয়েছিলাম স্পষ্ট নিদর্শন হিসাবে। কিন্তু তারা তার প্রতি যুলুম করেছিল। বস্তুতঃ আমরা ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই নিদর্শন সমূহ প্রেরণ করে থাকি’ (ইসরা ১৭/৫৯)।

সামূদ জাতির লোকেরা যে কূপ থেকে পানি পান করত ও তাদের গবাদি পশুদের পানি পান করাত, এ উষ্ট্রীও সেই কূপ থেকে পানি পান করত। উষ্ট্রী যেদিন পানি পান করত, সেদিন কুয়ার পানি নিঃশেষে পান করে ফেলত। অবশ্য ঐদিন লোকেরা উষ্ট্রীর দুধ পান করত এবং বাকী দুধ দ্বারা তাদের সব পাত্র ভরে নিত। কিন্তু এই হতভাগাদের কপালে এত সুখ সহ্য হল না। তারা একদিন পানি না পাওয়াকে অসুবিধার কারণ হিসাবে গণ্য করল। তাছাড়া উষ্ট্রী যখন ময়দানে চরে বেড়াত, তখন তার বিশাল দেহ ও অপরূপ চেহারা দেখে অন্যান্য গবাদি পশু ভয় পেত। ফলে তারা উষ্ট্রীকে মেরে ফেলতে মনস্থ করল। কিন্তু আল্লাহর গযবের ভয়ে কেউ সাহস করল না।

ইবনু জারীর প্রমুখ মুফাসসিরগণের বর্ণনা মতে, অবশেষে শয়তান তাদেরকে সর্ববৃহৎ কুমন্ত্রণা দিল। আর তা হল নারীর প্রলোভন। ছামূদ গোত্রের দু’ জন পরমা সুন্দরী মহিলা, যারা সালেহ (আঃ)-এর প্রতি দারুণ বিদ্বেষী ছিল, তারা তাদের রূপ-যৌবন দেখিয়ে দুজন পথভ্রষ্ট যুবককে উষ্ট্রী হত্যায় রায়ী করালো। অতঃপর তারা তীর ও তরবারির আঘাতে উষ্ট্রীর পা কেটে হত্যা করে ফেলল। হত্যাকারী যুবকদ্বয়ের প্রধানকে লক্ষ্য করেই কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ‘যখন তাদের সবচেয়ে হতভাগা লোকটি তৎপর হয়ে উঠেছিল’ (শামস ৯১/১২)।

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا

আল্লাহর রসূল তাদেরকে বললো : সাবধান ! আল্লাহর উটনীকে স্পর্শ করো না এবং তাকে পানি পান করতে বাধা দিয়ো না)

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا

কিন্তু তারা তার কথা প্রত্যাখ্যান করলো এবং উটনীটিকে মেরে ফেললো। অবশেষে তাদের গোনাহের কারণে তাদের রব ওপর বিপদের পাহাড় চাপিরে দিয়ে তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। (সূরা আস শামসঃ ১৩-১৪)

উষ্ট্রী হত্যার ঘটনার পর সালেহ (আঃ) স্বীয় কওমকে আল্লাহর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন যে,

تَمَنَّوْا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ

‘এখন থেকে তিনদিন তোমরা তোমাদের ঘরে আরাম করে নাও (এর পরেই আযাব নেমে আসবে)। এ ওয়াদার (অর্থাৎ এ সময়সীমার) কোন ব্যতিক্রম হবে না। (হুদ ১১/৬৫)।

কিন্তু এই হতভাগারা এরূপ কঠোর হুঁশিয়ারির কোন গুরুত্ব না দিয়ে বরং তাচ্ছিল্যভরে বলল,

يَا صَالِحُ اننَبَّا بِمَا نَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

‘হে সালেহ! তুমি যার ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে আস দেখি, যদি তুমি সত্যিকারের নবী হয়ে থাক। (আরাফ ৭/৭৭)।

তারা বলল, আমরা জানতে চাই, এ শাস্তি কিভাবে আসবে, কোথেকে আসবে, এর লক্ষণ কি হবে? সালেহ (আঃ) বললেন, আগামীকাল বৃহস্পতিবার তোমাদের সকলের মুখমন্ডল হলুদ হয়ে যাবে। পরের দিন শুক্রবার তোমাদের সবার মুখমন্ডল লালবর্ণ ধারণ করবে। অতঃপর শনিবার দিন সবার মুখমন্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যাবে। এটাই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন। তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা আরাফ ৭৭-৭৮।

একথা শোনার পর হঠকারী জাতি আল্লাহর নিকটে তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনার পরিবর্তে স্বয়ং সালেহ (আঃ)-কেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

নির্ধারিত দিনে গযব নাযিল হওয়ার প্রাক্কালেই আল্লাহর হুকুমে হযরত সালেহ (আঃ) স্বীয় ঈমানদার সাথীগণকে নিয়ে এলাকা ত্যাগ করেন। যাওয়ার সময় তিনি স্বীয় কওমকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ
তোমাদের কাছে স্বীয় পালনকর্তার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং সর্বদা তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি। কিন্তু তোমরা তোমাদের কল্যাণকামীদের ভালবাসো না’ (আরাফ ৭/৭৯)।

হযরত সালেহ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ভোরে অবিশ্বাসী কওমের সকলের মুখমন্ডল গভীর হলুদ বর্ণ ধারণ করল। কিন্তু তারা ঈমান আনল না বা তওবা করল না। বরং উল্টা হযরত সালেহ (আঃ)-এর উপর চটে গেল ও তাঁকে হত্যা করার জন্য খুঁজতে লাগল। দ্বিতীয় দিন সবার মুখমন্ডল লাল বর্ণ ও তৃতীয় দিন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেল। তখন সবই নিরাশ হয়ে গযবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। চতুর্থ দিন রবিবার সকালে সবাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে সুগন্ধি মেখে অপেক্ষা করতে থাকে। ইবনু কাছীর, সূরা আ ‘রাফ ৭৩-৭৮।

মহান আল্লাহ বলেছেন-

وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ

আর যারা জুলুম করেছিল একটি বিকট আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করলো এবং তারা নিজেদের বাড়ীঘরে এমন অসাড় ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে রইলো। হূদ:৬৮)

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ

অবশেষে একটি প্রলয়ংকর দুর্যোগ তাদেরকে গ্রাস করলো এবং তারা নিজেদের ঘরের মধ্যে মুখ খুবড়ে পড়ে রইলো। আরাফ ৭/৭৮

এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হল এমনভাবে, যেন তারা কোনদিন সেখানে ছিল না। অন্য আয়াতে এসেছে যে, ‘আমরা তাদের প্রতি একটিমাত্র নিনাদ পাঠিয়েছিলাম। তাতেই তারা শুষ্ক খড়কুটোর মত হয়ে গেল। (ক্বামার ৫৪/৩১)।

এমন বিকট শব্দ যে তারা অস্থির হয়ে পড়লো। শব্দ দিয়ে কিভাবে ধ্বংস হতে পারে তা এই জাতির অবস্থাকে দেখলে বুঝা যেতো। আর যখন এই শব্দ, মহান আল্লাহ যিনি সব শক্তির মালিক, সেই শক্তিশালী আল্লাহ আযাব হিসেবে যখন পাঠিয়েছেন, তা কত ভয়ংকর হতে পারে কল্পনা করা যায় না! ফলে সামুদ জাতির অবাধ্য লোকেরা এমনভাবে ধ্বংস হয়ে গেলো সেই শব্দের বিকটতায়, উপুড় হয়ে খুবড়ে পড়লো। আল্লাহ বলেছেন-

ঐ যে তাদের গৃহ তাদের জুলুমের কারণে শূন্য পড়ে আছে, তার মধ্যে রয়েছে একটি শিক্ষণীয় নিদর্শন যারা জ্ঞানবান তাদের জন্য। আর যারা ঈমান এনেছিল এবং নাফরমানী থেকে দূরে অবস্থান করতো তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি (নমলঃ৫২-৫৩)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْفَحْ ۖ ٥٤ : الصَّفْحُ الْجَمِيلُ

৮৫. আর আসমান, যমীন ও তাদের মাঝে অবস্থিত কোন কিছুই যথার্থতা ছাড়া সৃষ্টি করিনি এবং নিশ্চয় কিয়ামত আসবেই। কাজেই আপনি পরম সৌজন্যের সাথে ওদেরকে ক্ষমা করুন।

পৃথিবী ও আকাশের সমগ্র ব্যবস্থা হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বাতিলের ওপর নয়। বিশ্ব জাহান আল্লাহ তা’আলা অনাহত সৃষ্টি করেননি।

এখানে হক (অযথা নয়) বলতে উপকার ও কল্যাণ, যার উদ্দেশ্যে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি। অথবা হক বলতে সৎকর্মশীলদের সৎকর্মের প্রতিদান ও অসৎকর্মশীলদের পাপের বদলা দেওয়া। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, “আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই। যাতে তিনি যারা মন্দ কর্ম করে তাদেরকে দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। (সূরা নাজম ৩১)

অন্য আয়াতেও আল্লাহ তা বলেছেন। তিনি বলেন, “তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমরা তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না? সুতরাং আল্লাহ মহিমাম্বিত, প্রকৃত মালিক, তিনি ছাড়া কোন হক্ক ইলাহ নেই; তিনি সম্মানিত ‘আরশের রব।” [সূরা আল-মুমিনুন: ১১৫-১১৬ তারপর কিয়ামত সংঘটিত হওয়া যে অবশ্যস্বাবী সেটা বলেছেন।

(১) কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এ আয়াতের নির্দেশ হলো, সৌজন্যমূলকভাবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া। এ নির্দেশ পরবর্তীতে রহিত হয়ে গেছে। এখন শুধু “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এবং “মুহাম্মাদুররাসূলুল্লাহ” এ কালেমাই তাদের থেকে গ্রহণ করা হবে। [তাবারী] আয়াতের অন্য অর্থ হচ্ছে, সুতরাং আপনি তাদেরকে সুন্দরভাবে এড়িয়ে যান। [জালালাইন]

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۝ ۛ৛ : ৛৛

৛৛. নিশ্চয় আপনার রব, তিনিই মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।

আল্লাহ তা’আলা যে আখেরাতের পুনর্বাস সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন তাই প্রমাণ করছে। কারণ তিনি যদি মহান স্রষ্টাই হয়ে থাকেন তবে তার জন্য পুনর্বাস সৃষ্টি করা কোন ব্যাপারই নয়। তদুপরি তিনি সর্বজ্ঞানী। তিনি জানেন যমীন তাদের কোন অংশ নষ্ট করেছে এবং তা কোথায় আছে। সুতরাং যিনি মহাস্রষ্টা ও মহাজ্ঞানী তিনি অবশ্যই পুনরায় সবাইকে সৃষ্টি করতে পারবেন। অন্য আয়াতে আমরা এ কথাই প্রতিধ্বনি পাচ্ছি। যেখানে বলা হয়েছে: “যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তার ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছুই ইচ্ছে করেন, তিনি বলেন, ‘হও, ফলে তা হয়ে যায়’। [সূরা ইয়াসীন: ৛৛-৛৛]

স্রষ্টা হিসেবে তিনি নিজের সৃষ্টির ওপর পূর্ণ প্রভাব ও প্রতিপত্তির অধিকারী। তাঁর পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা কোন সৃষ্টির নেই। আবার এর সঙ্গে তিনি পুরোপুরি সজাগ ও সচেতনও। তুমি এদের সংশোধনের জন্য যা কিছু করছো তাও তিনি জানেন এবং যেসব চক্রান্ত দিয়ে এরা তোমার সংস্কার কার্যাবলীকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে সেগুলো সম্পর্কেও তিনি অবগত। কাজেই তোমার ঘাবড়াবার এবং অধৈর্য হবার প্রয়োজন নেই। নিশ্চিন্ত থাকো। সময় হলে ন্যায্য ফায়সালা চুকিয়ে দেয়া হবে।

وَ لَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝ ৛৛ : ৛৛

৛৛. আর আমরা তো আপনাকে দিয়েছি পুনঃ পুনঃ পঠিত সাতটি আয়াত ও মহান কুরআন।

سبع مثنائي (পুনঃপুনঃ পঠিতব্য সাতটি আয়াত) থেকে উদ্দেশ্য কি? এ সম্পর্কে মুফাসসিরীনদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। এর উদ্দেশ্য সূরা ফাতেহা এটাই সঠিক। যেহেতু এটি সাত আয়াতবিশিষ্ট এবং তা প্রত্যেক নামাযে বার বার পাঠ করা হয়। (মাসানীর অর্থ একাধিকবার পড়া)। হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং একটি হাদীসে নবী (সাঃ) বলেন, “আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন। এটি সাবএ মাসানী ও কুরআন আযীম, যা আমাদের দেওয়া হয়েছে। (বুখারীঃ তাফসীর সূরা হিজর) অন্য এক হাদীসে নবী (সাঃ) বলেছেন, “উম্মুল কুরআনই হল সাবএ মাসানী ও কুরআনে আযীম।’ (ঐ) সূরা ফাতেহা কুরআনের একটি অংশ, সেই জন্য সাথে সাথে কুরআন আযীমের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

আবু সাঈদ আল-মু’আল্লা বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেনঃ আমি সালাত আদায় করছিলাম এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছ দিয়ে গমন করার সময় আমাকে ডাকলেন। আমি আসলাম না। সালাত শেষ করে তার কাছে আসলে তিনি বললেনঃ আমার ডাকে সাড়া দিতে তোমাকে কে নিষেধ করল? আমি বললামঃ আমি সালাত আদায় করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ

আল্লাহ কি বলেননিঃ হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিও? তারপর তিনি বলেনঃ আমি কি তোমাকে মাসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা কি তা জানিয়ে দেব না?

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদ থেকে বের হতে যাচ্ছিলেন তখন আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি বলেনঃ “আলহামদু লিল্লাহ রাব্বিবল আলামীন” এটাই “সাবউল মাসানী” বা সাতটি আয়াত যা বার বার পড়া হয়, এবং কুরআনে কারীম যা আমাকে দেয়া হয়েছে।” [বুখারীঃ ৪৭০৩] অন্য বর্ণনায় আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “উম্মুল কুরআন” বা সূরা আল-ফাতিহা হলো “সাবউল মাসানী” এবং মহান কুরআন। [বুখারীঃ ৪৭০৪]

হাদীসের ভাষ্যসমূহ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, এখানে মহান কুরআন বলেও সূরা আল-ফাতিহাকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। সে হিসেবে সূরা ফাতেহাকে মহান কুরআন বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সূরা ফাতিহা এক দিক দিয়ে সমগ্র কুরআন। কেননা ইসলামের সব মূলনীতি এতে ব্যক্ত হয়েছে। [কুরতুবী] যদিও কোন কোন মুফাসসিরের মতে, কুরআনকে ভিন্নভাবে উল্লেখ করার অর্থ হলো, “আমরা আপনাকে সাবউল মাসানী সূরা ফাতেহা এবং পূর্ণ কুরআন দান করেছি। তখন দুটির অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হবে।

আল-কুরআনকে ‘মাসানি’ বা পুনঃ পুনঃ পঠিত কিতাব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন--

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ

আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা সুসামঞ্জস্য এবং যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। এতে, যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের শরীর শিউরে ওঠে, তারপর তাদের দেহ, মন বিনম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে। এটাই আল্লাহর হিদায়াত, তিনি তা দ্বারা যাকে ইচ্ছে হিদায়াত করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন হেদায়াতকারী নেই। সূরা যুমারঃ ২৩

একথাটিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথীদেরকে সান্তনা দেবার জন্য বলা হয়েছে। তখন এমন একটা সময় ছিল যখন নবী ﷺ এবং তাঁর সাথীরা সবাই চরম দুরাবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করছিলেন।

* নবুওয়াতের গুরু দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নেবার সাথে সাথেই নবী করীমের (সা.) ব্যবসায় প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

* ওদিকে দশ বারো বছরের মধ্যে হযরত খাদিজার (রা) সব সম্পদও খরচ হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে কিছু উঠতি যুবক ছিলেন। তাদেরকে অভিভাবকরা ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল। কতক ছিলেন ব্যবসায়ী ও কারিগর। অনবরত অর্থনৈতিক বয়কটের আঘাতে তাদের কাজ কারবার একদম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

* আর কতক দুর্ভাগ্য পীড়িত আগেই ছিলেন দাস বা মুক্ত দাস শ্রেণীভুক্ত। তাদের কোন অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডই ছিল না।

* এরপর দুর্ভাগ্যের ওপর দুর্ভাগ্য হচ্ছে এই যে, নবী (সা.) সহ সমস্ত মুসলমান মক্কা ও তার চারপাশের পল্লীগুলোতে চরম নির্যাতনের জীবন যাপন করছিলেন। তারা ছিলেন সবদিক থেকে নিন্দিত ও ধিকৃত। সব জায়গায় তাঁরা লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও হাসি-তামাশার খোরাক হয়েছিলেন।

* এই সঙ্গে মানসিক ও আত্মিক মর্মজ্বালার সাথে সাথে তারা দৈহিক নিপীড়নের হাত থেকেও রেহাই পাননি। অন্যদিকে কুরাইশ সরদাররা পার্থিব অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে সব রকমের সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের অধিকারী ছিল। এ অবস্থায় বলা হচ্ছে, তোমার মন হতাশাগ্রস্ত কেন? তোমাকে আমি এমন সম্পদ দান করেছি যার তুলনায় দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ তুচ্ছ। তোমার এ জ্ঞানগত ও নৈতিক সম্পদ ঈর্ষার যোগ্য ওদের বস্তুগত সম্পদ নয়। ওরা তো নানান হারাম উপায়ে এ সম্পদ আহরণ করেছে এবং নানাবিধ হারাম পথে এ উপার্জিত সম্পদ নষ্ট করেছে। শেষ পর্যন্ত ওরা একদম কপর্দক শূন্য ও কাংগাল হয়ে নিজেদের রবের সামনে হাজির হবে।

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۖ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

বলুন, এটা আল্লাহর অনুগ্রহে ও তার দয়ায়; কাজেই এতে তারা যেন আনন্দিত হয়। তারা যা পুঞ্জীভূত করে তার চেয়ে এটা উত্তম। সূরা ইউনুসঃ ৫৮

আবু সাঈদ খুদরী ও ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সহ অনেক মুফাসসির বলেছেন যে, ফদল অর্থ কুরআন; আর রহমত অর্থ ইসলাম। [কুরতুবী] অন্য বর্ণনায় ইবন আব্বাস বলেন, ফদল হচ্ছে, কুরআন, আর তার রহমত হচ্ছে এই যে, তিনি আমাদেরকে কুরআনের অনুসারী করেছেন। হাসান, দাহহাক, মুজাহিদ, কাতাদা বলেন, এখানে ফদল হচ্ছে ঈমান, আর তার রহমত হচ্ছে, কুরআন। [তাবারী; কুরতুবী]

আব্দুর রহমান ইবনে আবযা তার পিতা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেনঃ “আমার উপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে এবং আমাকে তা তোমাকে পড়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।” তিনি বললেন, আমি বললামঃ আমার নাম নেয়া হয়েছে? রাসূল বললেনঃ হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি আমার পিতা (উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বললামঃ হে আবুল মুনির! আপনি কি তাতে খুশী হয়েছেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ আমাকে খুশী হতে কিসে নিষেধ করল অথচ আল্লাহ তা'আলা বলছেনঃ “বলুন, আল্লাহর অনুগ্রহ ও তারই রহমতের উপর তোমরা খুশী হও” । [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ৩/৩০৪, আবু দাউদঃ ৩৯৮০]

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ۚ وَخَفَضْنَا جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ ٥٨ : ٥٩

৫৮. আমরা তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি তার প্রতি আপনি কখনো আপনার দুচোখ প্রসারিত করবেন না। তাদের জন্য আপনি দুঃখ করবেন না; আপনি মুমিনদের জন্য আপনার বাহু নত করুন,

একথাটিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাথীদেরকে সান্তনা দেবার জন্য বলা হয়েছে। তখন এমন একটা সময় ছিল যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাথীরা চরম দুরবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করছিলেন। অন্যদিকে কুরাইশ সরদাররা পার্থিব অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে সবরকমের সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের অধিকারী ছিল। এ অবস্থায় বলা হচ্ছে, আপনার মন হতাশাগ্রস্ত কেন? আপনাকে আমি এমন সম্পদ

দান করেছি যার তুলনায় দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ তুচ্ছ। আপনাকে কুরআন প্রদান করে আমরা মানুষের হাতে যা আছে তা থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছি।

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের অবাধ্যতায় হতাশ ও পেরেশান না হতে বলা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদেরকে দাওয়াত দিয়েই যাচ্ছিলেন কিন্তু তারা নিজেদের সম্পদ ও প্রতিপত্তিতে এতই মগ্ন ছিল যে, হকের বাণী তাদের কানে প্রবেশ করতো না। তারা ঈমান আনছিল না। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারপরনাই পেরেশান হয়ে যাচ্ছিলেন। এ অবস্থায় আল্লাহ তা' আলা তাঁর নবীকে সান্তনা দিচ্ছেন যে, আপনার এত পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আপনি সাথে নিয়ে এগিয়ে চলুন এবং বলুন যে, আমি তো প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী মাত্র। হেদায়েতের চাবিকাঠি তো আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে চান হেদায়াত দান করবেন।

আল্লাহ এই মহান কুরআন দেওয়ার পর রাসূল (সা.)-কে দুনিয়ার চাকচিক্যের দিকে তাকাতে নিষেধ করেছেন। কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এই একই নির্দেশনা এসেছে:

• সূরা ত্বাহা, আয়াত ১৩১: "আর আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি আপনি কখনো আপনার চোখ প্রসারিত করবেন না; তা তো পার্থিব জীবনের জাঁকজমক, যা দ্বারা আমি তাদের পরীক্ষা করি। আর আপনার প্রতিপালকের রিযিকই উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।"

• সূরা আল-কাহফ, আয়াত ২৮ (অংশবিশেষ): "...এবং আপনি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে আপনার চোখ দুটিকে তাদের থেকে ফিরিয়ে নেবেন না..."

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ৮৯ : ১৫

৮৯. এবং বলুন, নিশ্চয় আমিই প্রকাশ্য সতর্ককারী।

كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُفْتَسِمِينَ ৯০ : ১৫

৯০. যেভাবে আমরা নাযিল করেছিলাম বিভক্তকারীদের উপর

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ৯১ : ১৫

৯১. যারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে

কিছু ব্যাখ্যাকারীদের নিকট أَنْزَلْنَا ক্রিয়ার কর্মকারক الْعَذَابُ উহ্য আছে। যার অর্থ হল, আমি তোমাদেরকে সেইরূপ আযাব হতে প্রকাশ্য সতর্ককারী; যে রূপ আযাব মহান আল্লাহ বিভক্তকারীদের উপর অবতীর্ণ করেছিলেন। এই বিভক্তকারী কারা? যারা কুরআনকে বিভক্ত করে নিয়েছিল।

কেউ কেউ বলেন, তারা কুরায়েশ, যারা আল্লাহর কিতাবকে বিভক্ত করেছিল। তার কিছু অংশকে বলত যাদু, কিছু অংশকে বলত গণকের কথা, আবার কিছু অংশকে বলত উপকথা।

পক্ষান্তরে কিছু মুফাসসিরীন বলেন, বিভক্তকারী বলতে আহলে কিতাব এবং কুরআন বলতে তাওরাত ও ইঞ্জীলকে বুঝানো হয়েছে। তারা ঐ সকল কিতাবকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে রেখেছিল।

আবার কেউ বলেন, এর অর্থ আপোসে শপথ বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণকারী; এখানে সালাহ (আঃ)-এর জাতিকে বুঝানো হয়েছে, যেমন সালাহ আলাইহিস সালামের লোকেরা এরকম করেছিল। “তারা বলল, তোমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর, ‘আমরা রাতেই শেষ করে দেব তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে; তারপর তার অভিভাবককে নিশ্চিত করে বলব যে, তার পরিবার-পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি।” [সূরা আন-নামল: ৪৯] কারও কারও মতে, এখানে বাস্তবিকই সালাহ আলাইহিস সালামের কাওমের সে লোকদেরকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর]

عُضِينَ শব্দের অর্থ করা হয়েছে, বিভক্ত। শব্দটির অন্য অর্থঃ জাদু, গল্প। [বাগভী] এ অর্থের সমর্থনে সীরাতে গ্রন্থে এসেছে যে, ওয়ালাদ ইবনে মুগীরাহ কুরাইশের এক সমাবেশে হাজির হয়ে বললঃ হজ্জের মওসুম শুরু হয়ে গেছে। চতুর্দিক থেকে মানুষ এখন তোমাদের কাছে আসবে। এদিকে তোমাদের সাথী (মুহাম্মদ) সম্পর্কে তারা জেনে গেছে। তাই তোমরা তার ব্যাপারে একজোট হয়ে একটি মত পোষণ কর। তারা বললঃ তুমিই বল। সে বললঃ তোমরাই বল। তখন তারা বললঃ আমরা বলব সে গণক। তখন সে বললঃ সে গণক নয়।

তখন তারা বললঃ আমরা বলব সে পাগল। সে বললঃ না, সে তো পাগল নয়। তারা বললঃ আমরা বলব সে কবি। সে বলল, না সে কবিও নয়। তারা বললঃ আমরা বলব সে যাদুকর। সে বললঃ না, সে যাদুকরও নয়। তখন তারা বললঃ তাহলে আমরা কি বলব? সে বললঃ আল্লাহর শপথ তার কথায় আছে মাধুর্য, তোমরা যা-ই বল না কেন বুঝা যাবে যে তোমাদের কথাই বাতিল। তবে তার কথা যাদুকরের কাছাকাছি। এ কথার উপরই সবাই সেখান থেকে চলে গেল। আর এদিকে আল্লাহ তা’আলা তাদের সম্পর্কে নাযিল করলেনঃ “যারা কুরআন সম্পর্কে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়েছে, কাজেই শপথ আপনার রবের! আমরা তাদের সবাইকে প্রশ্ন করবই, সে বিষয়ে, যা তারা করে।” [বাগভী; সীরাতে ইবনে হিশাম]

সেই বিভক্তকারী দল বলতে এখানে ইহুদীদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাদেরকে বিভক্তকারী এ অর্থে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর দ্বীনকে বিভক্ত করে ফেলেছে। তার কিছু কথা মেনে নিয়েছে এবং কিছু কথা মেনে নেয়নি। এছাড়া তার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কাটছাঁট ও পরিবর্তন-পরিবর্তন করে অসংখ্য ফেকার জন্ম দিয়েছে। তাদের “কুরআন” বলতে তাওরাতকে বুঝানো হয়েছে। এ কিতাবটি তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে দেওয়া হয়েছিল যেমন উম্মাতে মুহাম্মাদীয়াতে কুরআন দেয়া হয়। আর এ কুরআনকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলার কথা বলে ঠিক এমন ধরনের একটি কর্মের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যেমন সূরা আল বাকারার ৮৫ আয়াতে বলা হয়েছেঃ

أَفْتَوْهُمْ نَبِغُضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের কিছু কথা মেনে নেবে এবং কিছু কথা অস্বীকার করবে?

তারপর যে কথা বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে আজ এই যে সতর্ক করা হচ্ছে এটা ঠিক তেমনি ধরনের সতর্কীকরণ যেমন ইতিপূর্বে ইহুদীদেরকে করা হয়েছিল, -----মূলত ইহুদীদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করানোই এর উদ্দেশ্য এবং ইহুদীরা আল্লাহর পাঠানো সতর্ক সংকেত থেকে গাফেল থাকার ফলে যে পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে তা তোমাদের চোখের সামনে রয়েছে। এখন ভেবে দেখো, তোমরাও কি এই একই পরিণাম দেখতে চাও?

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ ১২ : ১৫

৯২. কাজেই শপথ আপনার রবের! অবশ্যই আমরা তাদের সবাইকে প্রশ্ন করবই,

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ৯৩ : ১৫

৯৩. সে বিষয়ে, যা তারা আমল করত।

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজের সত্তার শপথ করে বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষকে তাদের কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে এবং তাদের ভালো-মন্দ কাজের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ঠিক একই বিষয়ে বলেন, وَلَنَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

অর্থ: "এবং তোমরা যা করতে, সে বিষয়ে তোমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সূরা আন-নাহল (১৬:৯৩)

نَبِيٍّ أَوْ أُمَّةٍ يُبَيِّنُ لَكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ: وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ

অর্থ: "অতঃপর যাদের কাছে রাসূল পাঠানো হয়েছিল আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করব এবং আমি অবশ্যই প্রশ্ন করব রাসূলদেরকেও। সূরা আল-আ'রাফ (৭:৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন কোনো মানুষ ৫টি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক কদমও নড়তে পারবে না।

"কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবার থেকে কোনো আদম সন্তানের পা দুটি নড়বে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে— ১. তার জীবনকাল সে কিসে শেষ করেছে, ২. তার যৌবনকাল কিসে অতিবাহিত করেছে, ৩. তার ধন-সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে, ৪. কিসে তা ব্যয় করেছে এবং ৫. সে যে জ্ঞান অর্জন করেছিল, সে অনুযায়ী কী আমল করেছে।"— [জামে' আত-তিরমিযী, হাদীস নং ২৪১৬]

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ৯৪ : ১৫

৯৪. অতএব আপনি যে বিষয়ে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

اصْدَعْ এর অর্থ প্রকাশ্যে প্রচার কর, এর পূর্বে তিনি গোপনভাবে তাবলীগ করতেন। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর প্রকাশ্যে প্রচার শুরু করেন।

ইসলামের শুরুর দিকে রাসূলুল্লাহ (সা.) গোপনে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। এই আয়াতটি নাজিল হওয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাআলা নবীজি (সা.)-কে প্রকাশ্যে ইসলামের বাণী প্রচার করার এবং মক্কার বহুঈশ্বরবাদী বা মুশরিকদের বাধা ও উপহাসকে উপেক্ষা করার নির্দেশ দেন।

وَ أَنْذَرِ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

আর আপনার নিকটস্থ জাতি-গোষ্ঠীকে সতর্ক করুন। সূরা আশ-শুআ'রা-২১৪

সূরা আল-মায়দাহ, আয়াত ৬৭: "হে রাসূল! আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার ওপর যা নাজিল করা হয়েছে তা পৌঁছে দিন; আর যদি না করেন তবে তো আপনি তাঁর বার্তা পৌঁছালেন না..."

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝ ١٥

১৫. নিশ্চয় আমরা বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আপনার জন্য যথেষ্ট

এ বাক্যে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের নেতা ছিল পাঁচ ব্যক্তি- আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে আবদে এয়াগুস, ওলীদ ইবনে মুগীরা এবং হারিস ইবনে তালাতিলা।
[বাগভী]

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ ١٦

১৬. যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ নির্ধারণ করে। কাজেই শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۝ ١٧

১৭. আর অবশ্যই আমরা জানি, তারা যা বলে তাতে আপনার অন্তর সংকুচিত হয়;

মক্কার কাফেররা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি নানা ধরনের কটুক্তি, মিথ্যা অভিযোগ, উপহাস ও বিদ্রূপ মন্তব্য করত। এতে তিনি অন্তরে কষ্ট পেতেন এবং দাওয়াতী কার্যক্রমের মহান দায়িত্ব আরও ভারী মনে হতো। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাঁকে সাবুনা দিয়ে বলেছেন, আপনার প্রতিপালক আপনার কষ্ট সম্পর্কে অজ্ঞাত নন। একজন আদর্শ দাঈ সবসময় প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন। তিনি মনে করেন সত্যের দাওয়াত বহন করা মানেই পরীক্ষা, চ্যালেঞ্জ ও বিপদের মুখোমুখি হওয়া। কঠিনতম সময়েও তিনি সত্যের উপর অটল থাকেন এবং ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর পথে অগ্রসর হন।

আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কাফেরদের কিছু অন্যায় আবদার, কটুক্তি, ঠাট্টা-বিদ্রূপ তার মনের যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তার জবাব দিয়ে সাবুনা দেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর] মূলতঃ তাদের আবদার ছিল নিরেট মুখুতা ও চরম অজ্ঞতাপ্রসূত।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে সাবুনা দিয়ে বলেন, ‘তাদের কথায় আপনি দুঃখিত হবেন না। নিশ্চয়ই সমস্ত সম্মান আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং মুমিনদের জন্য’ (আল-মুনাফিকুন, ৬৩/৪)।

তবে কি আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার কিছু আপনি বর্জন করবেন এবং তাতে আপনার মন সংকুচিত হবে এ জন্যে যে, তারা বলে, তার কাছে ধন-ভান্ডার নামানো হয় না কেন অথবা তার সাথে ফিরিশতা আসে না কেন? আপনি তো কেবল সতর্ককারী এবং আল্লাহ সবকিছুর কর্মবিধায়ক। সূরা হুদঃ ১২

وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۖ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

আর তাদের কথা আপনাকে যেন চিন্তিত না করে। নিশ্চয় সমস্ত সম্মান-প্রতিপত্তির মালিক আল্লাহ; তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। সূরা ইউনুসঃ ৬৫

এ কষ্ট নতুন কিছু নয়, পূর্ববর্তী নবীরাও বিরোধিতা, মিথ্যাচার ও নানা যন্ত্রণার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তারা ধৈর্যধারণ করেছিলেন, ফলে তাদের উপর আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হয়েছিল। আল্লাহ বলেন, ‘অতএব, ধৈর্যধারণ করুন, যেমন দৃঢ়চিত্ত রাসূলগণ ধৈর্যধারণ করেছিলেন’ (আল-আহকাফ, ৪৬/৩৫)।

وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَنَاهُمْ نَصْرُنَا

‘আপনার পূর্ববর্তী নবীদেরও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। তারা ধৈর্যধারণ করেছিলেন এবং কষ্ট সহ্য করেছিলেন, অবশেষে তাদের কাছে আমাদের সাহায্য পৌঁছেছিল’ (আল-আনআম, ৬/৩৪)।

সর্বশেষে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মানুষের কষ্টদায়ক কথাবার্তা উপেক্ষা করার এবং একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
‘কাফের ও মুনাফেকদের আনুগত্য করো না, তাদের কষ্টদায়ক কথায় ক্ষেপ করো না এবং আল্লাহর উপর নির্ভর করো’ (আল-আহযাব, ৩৩/৪৮)।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ৯৮ : ১৫

৯৮. কাজেই আপনি আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং আপনি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন;

অর্থাৎ এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, কেউ যদি শত্রুর অন্যায় আচরণে মনে কষ্ট পায় এবং হতোদ্যম হয়ে পড়ে, তবে এর আত্মিক প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ তা’আলার তাসবীহ ও ইবাদাতে মশগুল হয়ে যাওয়া। আল্লাহ তা’আলা স্বয়ং তার কষ্ট দূর করে দেবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা-ই করতেন। হাদীসে এসেছে, “যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কাজে সমস্যা অনুভব করতেন তখনই সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন।” [আবু দাউদঃ ১৩১৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৮৮] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ হে আদম সন্তান! দিনের প্রারম্ভে চার রাকাত সালাত আদায়ে অপারগ হয়ো না। কারণ এতে করে আমি তোমাকে শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট করব।” [আবু দাউদঃ ১২৮৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২৮৬]

...مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا

“যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা ও তাসবীহ) করবে, আল্লাহ তাকে প্রতিটি সংকীর্ণতা (মনের সংকোচন) থেকে বের হওয়ার পথ করে দেবেন এবং প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেবেন।” (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ১৫১৮)

মনের সংকীর্ণতা ও দুঃখ দূর করার বিশেষ দোয়া-----

রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে মন ভারাক্রান্ত হলে বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে এই দোয়াটি বেশি বেশি পড়তেন:

...اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

“আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজু বিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাজান, ওয়াল আজজি ওয়াল কাসাল...”

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-বেদনা থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে..."

(সহীহ বুখারী, হাদিস: ২৮৯৩)

وَاَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ৯৯ : ১৫

৯৯. আর আপনার মৃত্যু আসা পর্যন্ত আপনি আপনার রবের ইবাদাত করুন।

সত্যের বাণী প্রচার এবং সংস্কার প্রচেষ্টা চালাবার ক্ষেত্রে তোমাকে অশেষ কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। এগুলোর মোকাবিলা করার শক্তি তুমি একমাত্র নামায ও আল্লাহর বন্দেগী করার ক্ষেত্রে অবিচল দৃঢ়তার পথ অবলম্বন করার মাধ্যমেই অর্জন করতে পারো। এ জিনিসটি তোমার মনকে প্রশান্তিতে ভরে তুলবে, তোমার মধ্যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার জন্ম দেবে, তোমার সাহস ও হিম্মত বাড়িয়ে দেবে এবং তোমাকে এমন যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তুলবে যার ফলে সারা দুনিয়ার মানুষের গালিগালাজ, নিন্দাবাদ ও প্রতিরোধের মুখে তুমি দৃঢ়ভাবে এমন দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকবে যার মধ্যে তোমার রবের রেজামন্দি রয়েছে।

এখানে কুরআন ব্যবহার করেছে يَقِين শব্দটি। সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম শব্দটির তাফসীর করেছেনঃ মৃত্যু। [বুখারীঃ ৪৭০৬] কুরআন ও হাদীসে ‘ইয়াকীন’ শব্দটি মৃত্যু অর্থে ব্যবহার হওয়ার বহু প্রমাণ আছে।

পবিত্র কুরআনে এসেছেঃ “তারা বলবে, আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, আমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করতাম না, এবং আমরা বিভ্রান্ত আলোচনাকারীদের সাথে বিভ্রান্তিমূলক আলোচনায় নিমগ্ন থাকতাম। আমরা কর্মফল দিন অস্বীকার করতাম, শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে মৃত্যু এসে যায় [সূরা আল-মুদাসসিরঃ ৪৩-৪৭] অনুরূপভাবে হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে মাযউন এর মৃত্যুর পর তার সম্পর্কে বলেছেনঃ “কিন্তু সে! তার তো يَقِين তথা মৃত্যু এসেছে, আর আমি তার জন্য যাবতীয় কল্যাণের আশা রাখি। [বুখারীঃ ১২৪৩]

সুতরাং বুঝা গেল যে, এখানে يَقِين শব্দের অর্থ মৃত্যুই। আর এ অর্থই সমস্ত মুফাসসেরীনদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। সে হিসেবে প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত করে যেতে হবে। যদি কাউকে ইবাদত থেকে রেহাই দেয়া হতো তবে নবী-রাসূলগণ তা থেকে রেহাই পেতেন কিন্তু তারাও তা থেকে রেহাই পাননি। তারা আমৃত্যু আল্লাহর ইবাদত করেছেন এবং করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং যদি কেউ এ কথা বলে যে, মারেফত এসে গেলে আর ইবাদতের দরকার নেই সে কাফের। কারণ সে কুরআন, হাদীস এবং ইজমায়ে উম্মাতের বিপরীত কথা ও কাজ করেছে। এটা মূলতঃ মূলহিদদের কাজ। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ড থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

ইসলাম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকার জীবনব্যাপী দিকনির্দেশনা দিয়েছে। ইবাদতের চূড়ান্ত সীমানা হলো মৃত্যু, এর আগে ইবাদত থেকে অব্যাহতি লাভের কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْأَمُوا تَنْزِيلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ

‘নিশ্চয় যারা বলে, আল্লাহ আমাদের রব, তারপর তার উপর (মৃত্যু পর্যন্ত) অটল থাকে, তাদের উপর ফেরেশতারা নাযিল হন’ (ফুহুছিলাত, ৪১/৩০)।

মুসলিমের জীবন শুধু মাসিক বা বার্ষিক কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদতের নাম নয়; বরং মৃত্যু পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ইবাদতের ধারাবাহিক যাত্রা। নিরবচ্ছিন্ন ইবাদতের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আল্লাহকে যথাযথ ভয় করুন এবং মুসলিম হওয়া ব্যতীত মৃত্যুবরণ করবেন না’ (আল-আনআম, ৩/১০২)।

আল্লাহ তাআলা বান্দার নিকট থেকে নিরবচ্ছিন্ন ইবাদত প্রত্যাশা করেন। মৃত্যু যেহেতু জীবনের শেষ সীমা, তাই মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বান্দার দায়িত্ব হলো আল্লাহর প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখা। কুরআনে অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ‘যেদিন তারা মারা যাবে, সেদিন পর্যন্ত তারা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং আল্লাহর হুকুম থেকে বিমুখ হবে না(মোরইয়াম, ১৯/৫৯)।

প্রকৃত শক্তি মানুষের জিহ্বায় নয়; বরং প্রকৃত শক্তি নিহিত থাকে আল্লাহর স্মরণে অবিচল অন্তরে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেমন ভয় করা উচিত এবং মুসলিম হওয়া ব্যতীত মৃত্যুবরণ করো না’ (আলে ইমরান, ৩/১০২)।

মূল শিক্ষা ও ব্যাখ্যা:

- ইবাদতের ধারাবাহিকতা: একজন মুমিনের ইবাদত জীবনের কোনো বিশেষ সময়, বয়স বা নির্দিষ্ট মৌসুমের (যেমন শুধু রমজান মাস) মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মৃত্যু আসার আগ পর্যন্ত আমৃত্যু আল্লাহর হুকুম পালন ও ইবাদতের ওপর অবিচল থাকতে বলা হয়েছে।

- আস্থা ও ধৈর্য: কাফেরদের উপহাস বা বিরূপ পরিস্থিতিতে নবীজি (সা.)-কে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এ আয়াতে